International peer Reviewed Journal
ISSN 2321-7340 Print
ISSN 2583-360X online
Lok-Utsa 5, Vol.-2: Issue-I: January 2023

মাটির সংস্কৃতির উৎস সন্ধানে—

লোক-উৎস

মুখ্য সম্পাদক
ড. পরিমল বর্মণ

মাথাভাঙ্গা * কুচবিহার

LOKA-UTSA 5
Vol: 2, Issue: 1
January, 2023
ISSN 2321-7340 for Print
ISSN 2583-360X For Online
Chief Editor : Dr. Parimal Barman

RNI Tittle Verified No:WBMUL00685
Language : Multiple Language
Annual Peer Reviewed Research Journal
on Arts & Literature and All Humanitics
Rs.299.00 for India, 5$ USD for others Country

স্বত্ব : সম্পাদক

প্রচ্ছদ ও অক্ষর বিন্যাস : দীপক বর্মণ, সূর্যদেব বর্মণ

প্রকাশক ও সম্পাদনা দপ্তর
ড. পরিমল বর্মণ
সংস্কৃতি ভবন, ওয়ার্ড নং-১১
পচাগড়, মাথাভাঙ্গা রোড
পো:-মাথাভাঙ্গা, কুচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, পিন-৭৩৬১৪৬
প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি, ২০২৩
মোঃ ৭৬০২১৩০৩০১/৮৯১৮৩৬৭৪৩৩
www.lokutsa.com
Email: chiefeditor@lokautsa.com

মুদ্রণ : শান্তি উদ্যোগ, সুকিয়া স্ট্রিট, কলকাতা

মূল্য : ২৯৯.০০ টাকা মাত্র

বাঁকুড়া জেলার লোকসংগীতে টুসুগান: একটি সমীক্ষা

সোনাই চ্যাটার্জ্জী
গবেষক বাংলা বিভাগ
ভাষাভবন বিশ্বভারতী

গঠন প্রকৃতি অনুসারে Folklore বা লোকসংস্কৃতিকে দুটি শাখায় ভাগ করা যায়—

ক। বস্তুনির্ভর লোকসংস্কৃতি বা Material Folklore.

খ। অ-বস্তুনির্ভর লোকসংস্কৃতি বা Non-Material Folklore.

এই দুই শ্রেণির মধ্যে প্রথম ভাগে লোকসংস্কৃতির যে বিষয় গুলিকে অন্তর্গত করা যায় সেগুলি হল—শিল্প, ভাস্কর্য, পোশাক-আশাক ইত্যাদি। অন্যদিকে দ্বিতীয় শ্রেণির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয় লোকসাহিত্যকে। 'লোক' কাদের বলবো?—এই নিয়ে পণ্ডিত মহলে বিস্তর মত পার্থক্য রয়েছে।

Webster's New Collegiate Dictionary-তে 'Folk' এর সংজ্ঞায় জানিয়েছেন—"The great proportion of the members of a people that determines the group charactorand that tends to preserve its characteristics from of civilization and its customs, arts and crafts, legands, tradition and superstitions, from generation to generation."[১] অর্থাৎ 'লোক' হল সাধারণ মানুষের একটা বৃহৎ অংশ যারা সভ্যতা, ঐতিহ্য, প্রথা ও বিশ্বাসের বিশিষ্ট রূপকে বংশানুক্রমিক ভাবে ধারণ এবং বহন করে চলেছে। আর লোকসাহিত্য হল একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিবেশে বসবাসকারী গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত ঐতিহ্য, যা বহুকাল ধরে চলে আসছে এবং সেখান থেকে উদ্ভব সংহত সমাজের সৃষ্ট মৌখিক রচনা। লোকসাহিত্য মৌখিক সাহিত্য। এর জন্য অঞ্চল ভেদে লোক সাহিত্যের বিভিন্ন পাঠ লক্ষ করা যায়। লোকসাহিত্য গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের মুখনিঃসৃত কথনকলা স্বরূপ। এই সব মানুষেরা ডিগ্রিধারী শিক্ষায় শিক্ষিত না হলেও প্রকৃতির পাঠশালায় স্বশিক্ষিত। লোকসাহিত্য কোন একজন ব্যক্তির দ্বারা সৃষ্টি হলেও স্রষ্টার মুখ থেকে ধীরে ধীরে সংহত সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। একজন বিখ্যাত সমালোচক লোকসাহিত্যের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে বলেছেন—é"Folk literature is simply literature transmitted orally."[২] এজন্য লোকসাহিত্যে পরিশীলিত ঠাকুর লোকসাহিত্যকে

আধুনিক সাহিত্যের মূল শিকড় বলে অভিহিত করেছেন। তিনি তাঁর ''লোকসাহিত্য'' গ্রন্থের 'গ্রামসাহিত্য' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন—''গাছের শিকড়টা যেমন মাটির সঙ্গে জড়িত এবং তাহার অগ্রভাগ আকাশের দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তেমনি সর্বত্রই সাহিত্যের নিম্ন অংশ স্বদেশের মাটির মধ্যেই অনেক পরিংাণে জড়িত হইয়া ঢাকা থাকে; তাহা বিশেষরূপে সংকীর্ণরূপে দেশীয়, স্থানীয়।''[৩]

লোকসাহিত্যের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা গুলির মধ্যে লোকসংগীত বিভাগটি সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। লোকসংগীতের সংজ্ঞাদিতে গিয়ে বিখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ্ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন—''যাহা একটি মাত্র ভাব অবলম্বন করিয়া গীত হইবার উদ্দেশ্যে রচিত ও লোকসমাজ কর্তৃক মৌখিক প্রচারিত হয়, তাহাকেই লোকগীত Folk Song বলে।''[৪] লোকসংগীত সংহত সমাজ ভাবনার জীবন্ত জীবাশ্ম। লোকসংগীত সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে সুন্দর ভাবে প্রতিফলিত করে। একটি জাতির ইতিহাসের পদ ধ্বনি লোকসংগীতের সুরে ভেসে ওঠে। এই প্রসঙ্গে এই মন্তব্যটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য—''বাংলা দেশকে জানিতে হইলে গানের মধ্যে দিয়া ইহাকে জানা যত সহজ, অন্যকোন বিষয়ের মধ্য দিয়াই তাহা সহজ নহে। প্রাচীনতম কাল হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কাল পর্যন্ত বাঙ্গালীর সাধনার শ্রেষ্ঠসম্পদই তাহার সঙ্গীত। বাঙ্গালীর ধ্যান, ধারণা, সামাজিক, আচার-আচারণ, ব্যক্তি ও গোষ্ঠী জীবনের সুখ-দুঃখের অনুভূতি সবই সঙ্গীত সাধনায় যে বৈচিত্র প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করিতে না পারিলে বাঙ্গালীর চরিত্র এবং তাহার জাতীয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা যাইবে না।''[৫]

আমরা লাল মাটির দেশ, শাল-মহুয়া-পলাশ এ বেষ্টিত বাঁকুড়া জেলার জনপ্রিয় লোকসংগীত টুসু গান নিয়ে পর্যালোচনা করবো। প্রথমত টুসু গান নিয়ে বিশ্লেষণ করার পূর্বে 'টুসু' নামের উৎপত্তির ইতিহাস, নামের মতানৈক্য, টুসুকে নিয়ে প্রচলিত পাল পার্বণ এবং সবশেষে টুসুকে নিয়ে নির্মিত গানগুলোর গুরুত্ব খোঁজার পাশাপাশি; সামাজিক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক ইত্যাদি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে টুসুগানগুলি পর্যায়ক্রমে বিচার বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করবো।

টুসু মূলক কৃষি কেন্দ্রিক দেবী। কৃষি সভ্যতার সঙ্গে সংযুক্ত লোকজীবন তথা গ্রামীণ সংস্কৃতির আদরের কন্যা টুসু। অঞ্চল ভেদে টুসুকে নানান নামে ডাকা হয়। যেমন-টুসুমণি, টুসুরাণি, তুষুধন ইত্যাদি। অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তির দিন থেকে

টুসু পূজার সূচনা হয়। সংক্রান্তির পূর্ব দিন মাটির সরাতে তুষ (ধানের খোসা), সরষে ফুল, মূলাফুল, গাঁন্দাফুল, দূর্বা সংগ্রহ করে রাখা হয়। এরপর গোবর ও তুষ দিয়ে নাড়ুর মতো আকৃতির ঢেলা বানানো হয়। ১৪৪টি নাড়ু প্রস্তুত করে সরার মধ্যে রেখে তার উপর সংগৃহীত ফুল, দূর্বা রেখে টুসু পূজা শুরু হয়। তবে অঞ্চল ভেদে এই পদ্ধতির অন্যথা ও লক্ষ করা যায়। পৌষ মাস ধন সমৃদ্ধির মাস। এই সময় চাষীরা ধান লদীকে খামারে আনে। সন্ধ্যা নামতেই কুলকাঠের আগুন জ্বেলে পুসু গানে মেতে ওঠে গ্রাম বাংলার আবাল বৃদ্ধবনিতা। বাড়ির তৈরি বিভিন্ন মিষ্টি, পরোটা, বাদাম ভাজা, মুড়ি আরো হরেক রকমের খাবার টুসুপূজায় ভোগ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এই ব্রত পার্বণে কোনো মন্ত্রের ব্যবহার নেই। গান গেয়ে টুসুর আরাধনা চলে গভীর রাত পর্যন্ত। তবে পৌষ মাসের দিন যত এগোতে থাকে টুসুর গান গাওয়ার সময়সীমা তত বাড়তে থাকে। পৌষের সংক্রান্তির আগের দিন সারারাত ধরে জাগরণ পর্ব চলে। দল বেঁধে মেয়েরা পালা সকাল পর্যন্ত গান করে। আগের দিনগুলোতে টুসুকে পাড়া ঘোরানো হয়। এই পর্বে এই পাড়ার লোকেরা ঐ পাড়ায় নেমন্তন্ন পায়। অনুরূপ ভাবে ঐ পাড়ার লোকেরা এই পাড়ার নেমন্ত্রন্ন রক্ষা করে। সংক্রান্তির দিন সকালে টুসুকে চৌদ্দালা করে নদীতে বা পুকুরে বিসর্জন দেয়। বিসর্জনের সময় পর্বে মা বোনেরা অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে গান গায়। টুসুর আগমন এবং বিদায়, ঘরের মেয়ে উমার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

টুসু শব্দটির জন্ম সংস্কৃত শব্দ থেকে হয়নি। এটি অস্ট্রো এশিয়াটিক কোল গোষ্ঠীর শব্দ। টুসুকে কেউ গৃহলক্ষ্মী, কেউ শস্যের দেবী বলেন। অনেকের মতে উর্বর জমিতে উৎকৃষ্ট মানের ভালো ফসল লাভের আশায় টুসুর পূজা করা হয়। সুকুমার সেনের মতে—''টুসু বা তুষু (তোষালা) পুষ্যাবাতিষ্যা নক্ষত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং তিষ্যা নক্ষত্রে অনুষ্ঠিত শস্যোৎসবেরই প্রবহমান ধারা।''[৬] 'টুসু' এবং 'তুষু' এই দুই শব্দ নিয়ে বিস্তর মত পার্থক্যের জন্ম নিয়েছে বিদগ্ধ মহলে। তুষ হল ধানের খোসা কেদু-খণ্ড করে ছাড়ালে যে আবরণ পাওয়া যায় সেই অংশ। আর সেখান থেকেই 'তুষ' শব্দের উৎপত্তি (তুষ>তুষু)। অন্য শ্রেণির পণ্ডিতেরা মনে করেন ধান গাছের একেবারে ডগা বা টগ বরাবর (একেবারে শেষ প্রান্তের ধান শিস) যে ধান শিসটি থাকে, সেখান থেকেই 'টুসু' নামকরণ হয়েছে। এই শ্রেণির পণ্ডিতেরা মনে করেন, যে কোনো বীজই নতুন ধানের মহীরুহকে সৃষ্টি করে। তুষ হল ধানের ভুয়া অংশ, যেখানে কোনো প্রাণের স্পন্দন বা ধন সম্পদের সমৃদ্ধি থাকে না। এই বছরের ধানের বীজ পরের বছর শস্য ফলাবে, তাই তারা

মনে করেন 'টুসু' নামকরণটি বিজ্ঞান সম্মত বা বেস্বীকৃত। এদিক থেকে এই নামটিই যথাযথ বলে আমি মনে করি। রাঢ় বাংলার অনেকে টুসু ও ভাদুর মূর্তিকে এক করে দেখেন। এর কারণ জানাতে গিয়ে লোকসাহিত্য রসিক অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন—''মানভূমের ভাদু মূর্তির অনুকরণে টুসুমূর্তির প্রচলন। কথাটি খুবই সত্য সম্ভূত বলেই মনে হয়।''[৭]

কথায় বলে-চাঁউড়ি বাউড়ি মকর আখ্যান/ঘ্যাঘান শাইশুই, তারপরদ্দিন আসবি তুই। এই চাঁউড়ি-বাঁউড়ি-মকর এই তিন দিন খুব সমারোহের সঙ্গে টুসু গান গাওয়া হয়। চাঁওড়ির দিন মেয়ে বৌরা ঢেঁকিতে চালের মণ্ডঁড়ো তৈরি করে, বাঁউড়ির দিন বাঁউড়ি বাঁধা এবং বিভিন্ন আকৃতির (অর্ধচন্দ্রাকৃতি, ত্রিকোণাকৃতি ও চতুষ্কোণাকৃতির) পিঠে তৈরি করা হয়। মকরের দিন চৌদ্দালায় করে টুসু গান গাইতে গাইতে নদীতে বা পুকুরে টুসুকে ভাসানো হয়। তারপর মকর স্নান সেরে বড় আগুনের কুমায় আগুন পুহিয়ে পিঠে খাওয়া হয়। একটি টুসু গানে চাঁওড়ি বাঁউড়ির পরিচয় মেলে—

চাঁওড়ির দিন চাল কুটেছি
বাঁউড়ির দিন গড়বো গ্যাড়গ্যাড়া
টুসুকে দুবো টাটকা পিঠা
সাথে দুবো মহলার খেজুর গুড়।

গানটিতে পৌষপার্বণের পিঠে-পুলি উৎসব, মহলের সতেজ খেজুর গুড়ের ছবি চিত্রিত হয়েছে।

করোনা মহামারীর প্রভাব সমগ্র বিশ্বে ছাপ ফেলেছে। এর হাত থেকে রক্ষা পায়নি ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে। সাধারণ লোকজীবনেও নেমে এসেছে কালের করাল গ্রাস। টুসুরাণীকে এবার আনতে পারেনি বাপের ঘরে, তাই মা বোনেদের কণ্ঠে শোনা যায়—

বাপের ঘরে আলিনাই মা কাল রোগেরই ডরে।
সারাবছর তোর লাগ্যে রই পথের পানে ভাল্যে
ইঘর আমার ভরে উঠে মকর পরব আল্যে।
আসবি বইলে কত গানের সুর বাইনধ্যে ছিলম সুর
গুড়ি কউট্যে, তিলের পুর আর দুধের চাঁচির পুর;
গণ্ডা তিনেক নারকেলও মা রাখ্যেছি গুড় মাখ্যে
হরেক রকম হইতে পিঠা, খাথিস মনে সুখে

আইসতে লারলি মনে নাই যে মাগো সুখ,
চাঁদ পানা তোর মুখটি দেখলেই জুড়্যায় যাত্য বুক
শাউড়ি-শ্বশুর-জামাই তখে পাঠাল্য নাই ভয়ে
পরের বছর আসবি মাগো, আছি যে পথ চাইয়ে।

লকডাউনে সাধারণ মানুষের রুজিরুটি বন্ধ, রোজগারের কোন উপায় নাই। ঘরের লোকেদের দুবেলা খাবার জোটাতে হিমসিম খাচ্ছে মানুষজন। এই অবস্থায় টুসু এসেছে—

ট্রেনবন্ধ, বাসবন্ধ, কাজবন্ধ, পকেটে টান পড়েছে
লকডাউনে টুসু আস্যেছে
ক্যামনে হবে পিঠা মুড়ি, কি করে জামাকাপড়
টুসু আমার রাগ করেছে।

টুসুর রূপ সজ্জায় একাধিক গান রয়েছে। এই গানগুলি যেন গ্রাম্য মেয়েরই রূপ সজ্জায় নিদর্শন। গান গুলিতে বাঁকুড়ার বিভিন্ন স্থানের নাম উল্লেখিত হয়েছে। টুসু ঘরের মেয়ে, তাই মা বোনেরা গেয়ে উঠেছে—

১। টুসুরাণীর সাধ হয়েছে লিবেক কানের দুল
পার্লারেতে যাবেক টুসু রঙ করবেক চুল।
লাল টুকটুক জামদানি চাই, পায়ে রুপার তোড়া,
স্কুটি চাইপ্যে যাবেক টুসু বাপের বাড়ির পাড়া।
ফিরতি পথে কলেজ মোড়ে ফুচকা মোমো খাবেক
ভৈরবস্থানে মিষ্টি লিয়ে শ্বশুর বাড়ি যাবেক।
২। মকর আল্যও টুসু তুই কিনবি কি কিনল?
ঝট কইরে সাইতে করে লে চকবাজারে চল
নানান রকম গয়না কিনে সাজবি মকর দিনে
উমাদৎ এর তাঁতের শাড়ি দুবো তখে কিনে।
মণিহারীর দোকানে যাবি লিবি সিটিগোল্ডের হার
বাছাই করে গাডার চুড়ি কিনবি গোটা চার।
৩। আলতা পরা পা টুসুর নামাও ক্যানে খাট থাইকে
মন ভরে বা বাপের মায়ের টুসুরাণীর রূপ দেখে
বাইরে বেরাও না টুসু রইছে দিনের আলো
চিকন পারা সোনার বরণ হইয়ে যাবেক কালো

বিয়ার বয়স হইছে তুমার সমন্ধ আইছে রোজ
দেখে শুনে করবো জামাই, ঘটকে রাখ্যেছে খোঁজ
সাধের বিটির বিয়া দুব সাধের বেটার সংগে
স্বর্ণচরী শাড়ি দিবেক, গয়না সারা অংগে।

গানটিতে যুবতী টুসুর বিবাহের জন্য তোড় জোড় চলছে। এজন্য বাড়ির মেয়ের মতোই টুসুকে নানান নিষেধাজ্ঞা মেনে চলার কথা বলা হয়েছে। টুসুর স্নানের বিষয়টি তে আধুনিকতার ছাপ স্পষ্ট হয়েছে নিম্নোক্ত গানটিতে—

আমার টুসু সিনানেতে যায় গন্ধেশ্বরীর জলে
যাইওনা যাইওনা মাগো শাউড়ি কথা বলে।
সোনার বরণ অমন রূপে নজর দিবেক লোকে,
সিনান ঘর বানায়ে দিব চান কইরবে গো সুখে।
শাওয়ার লাগায় দিব টুসু, দিব গরম জলের কল।
দামি সাবান শ্যাম্পু দুব মা, আরকি লিবি বল।

এছাড়া নিজের টুসুর গুন গান গাওয়া এবং অন্যের টুসুকে ছোট করে দেখানোর সংগীতও বাঁকুড়ার গ্রামগুলিতে লক্ষ করা যায়—

১। আমার টুসু মুড়ি ভাঁজে, চুড়ি ঝলমল করে
লোকের টুসু কাঁকর ভাঁজে, চুড়ি নাইমা হাতে।
২। আমার টুসু জলকে যাবে সোনার কলসি লিয়ে
তোদের টুসু জলকে যাবে ছেন্দা কলসি লিয়ে।
৩। আমার টুসু চিঠি লেখে,কলম চালায় জোরে
তোদের টুসু গোমুখ্যু, থ্যাবড়া নাকে ঝগড়া জুড়ে।

গৃহস্থ জীবনের সুখ-দুঃখ, নারীর শিক্ষার অধিকার, নারীসমাজের উপর পুরুষের অত্যাচার, বিশেষ করে শ্বশুরবাড়ির লাঞ্ছনা বঞ্চনার সুর প্রাণবন্ত হয়ে ধরা পড়েছে নিম্নোক্ত গানগুলিতে—

১। কালের কেমন বিচার
ঝি-ছানার কি নাইখ বাঁচার অধিকার?
হেলায় ফেলায় বড় হলেও
জুটে কি সমান আচার?
লেখাপড়া আগাগোড়া
ঝি-ছানার কপালপোড়া

দিন কাটে দিন কাজে কাজে
ঘর-কুট্যালি ঝিছানার।
২। এক পিঠ চুল আমার টুসুর
কিম দশা করেছে খালভরা জামাইবেটা
এবার মা তালছোড়া এলে ঝাঁটা মারবো পিঠে
আর বিটিক পাঠাবো না যমের ঘরে।
৩। দাদা মোর বিয়া দিলি
বড় নদীর উধারে
এত বড় পৌষ পরবে রাখলি পরের ঘরে
পরের ঘরে জলঘেরা পিঠা
ভাগের সময় দেয় দুটা।
৪। আধ পাই ধানের দু'পাই মুড়ি খেয়ে যা লো শাশুড়ি
আর যাবোনা শ্বশুড় বাড়ি ধরে মারে আটকুড়ি
এক কিল মারে দুকিল মারে, তিন কিল মারলে সইবো না
বারণ করবে গুণের দেওর তোর ঘর করবো না।
৫। বাপের ঘরে ছিলম ভাল কাখে গাগরা চালভাজা
শ্বশুড় ঘরে বড়জ্বালা লোক বুঝাতে যায় বেলা।

আবার রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের কর্মসূচি, রাজনৈতিক ক্ষমতার বলীয়ান হয়ে নেতানেত্রীদের ক্ষমতার অপব্যবহার, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তাও টুসুগানে প্রতিফলিত হয়েছে—

১। লঙ্কা যে জন যায় সেই হয় রাবণ রাজা
রাবণ রাজা রাক্ষস রাজা
সেজন হয় কিসুজন।
২। ভালবাসা বলব কাকে
ভোটের বাজারে মিষ্টি মুখের ছলচাতুরী
আনব না সব জনতা দল
দিল্লী কলকাঠি লড়ে
বিল্লি বাজী রসাতল।
৩। দেশে দেশে ঘুরলে টুসু
দেশের কি সমাচার

মানুষে মানুষ খাচ্ছে হায়
কড়া-গণ্ডা অনাচার।
৪। কেউবা বলে দেশটা রামের
কেউবা বলে রহিমের
দেশটা যে মানুষে ভরা
নাইখ খিয়াল দেশ নেতার
মানুষ নামে ভাসাতরী
মানুষ ইহাল হাতিয়ার।

বাঁকুড়া জেলার লোকসংস্কৃতি তথা লোকসাহিত্যের মূল্যবান মনিমাণিক্যের ভিড়ে লোকসংগীত আলাদা জায়গা করে নিয়েছে। বিদগ্ধজনের কাছে। জেলার এই গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ গুলোকে রক্ষা করার দায়িত্ব সকলের। ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গিয়ে নিজের চোখে দেখেছি আগের বছর টুসু গান গাওয়া মানুষগুলি আর এই বছর টুসুর ব্রত, টুসুর গান গায় না, তারা এখন অন্য কাজে ব্যস্ত। তার মধ্যেই বেশকিছু মেলায় (রকুল, এক্তেশ্বর ইত্যাদি) টুসু গানের দল আসে। এছাড়া বেশকিছু স্থানে (গড়েরবন, সিমলাপাল, ডাবরা, পেতাখানা, মোলবনা, শালবনী) টুসু ব্রত পার্বণের সঙ্গে সুরেলা কণ্ঠের টুসু গান শোনা যায়। লোকসাহিত্য সদা পরিবর্তনশীল উপরিউক্ত গানগুলিতে আমরা তার নমুনা পেয়েছি। তবে কালের করাল গ্রাসে যাতে করে গানগুলি হারিয়ে না যায়, তার জন্য গানগুলি সংগ্রহ করা একান্ত আবশ্যক। বাঁকুড়া জেলায় টুসু গানের মাধুর্য, বিপুল বৈচিত্রের গৌরব দীর্ঘদিন বজায় থাক। পৌষের সন্ধ্যায় টুসু গানে মুখুরিত হোক গ্রাম বাংলার আকাশ বাতাস।

সূত্র নির্দেশ :

১। লোকসংস্কৃতির মেথডলজি-শ্রীসনৎ কুমার মিত্র (সম্পাদিত), সাহিত্য প্রকাশ, ৬ কৈলাশ ঘোষরোড, কলকাতা-৭০০০০৮, পৃ:২০৬।
২। বাংলা লোক সাহিত্য চর্চার ইতিহাস—বরুণ কুমার চক্রবর্তী, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়া টোলা লেন, কলকাতা-৯, পৃ: ৪।
৩। লোকসাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, প্রকাশ ১৩১৪,পৃ: ৯১।
৪। রাঢ় বাংলার লোকসংস্কৃতি—ড. সুজিত কুমার বিশ্বাস, আনন্দ প্রকাশন, সি-৮, কলেজস্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা ৭, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৫, পৃ:

১৮২।
৫। বাংলা লোক সাহিত্য চর্চার ইতিহাস—বরুণ কুমার চক্রবর্তী, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়া টোলা লেন, কলকাতা ৯, পৃ:২৯৩।
৬। কৃষি কেন্দ্রিক পালপার্বণ—মেঘদূত ভুঁই, টেরাকোটা, প্রথম প্রকাশ বাঁকুড়া বইমেলা, ডিসেম্বর ২০২১, পৃ: ১৪৯।
৭। সীমান্ত বাংলার লোকযান—সুধীর করণ, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা ৯, প্রথম সংস্করণ ফাল্গুন, ১৩৭১, পৃ: ১৭০।
৮। ক্ষেত্রসমীক্ষা—শালবনী (শুক্লাকর), মোলবনা (মেঘদূতভুঁই), গড়েরবন (বাউরি পাড়ার মহিলারা)।